প্রত্যাবর্তন

সম্পাদনা

আরিফ আজাদ

শার'ঈ সম্পাদনা

আলী হাসান উসামা

সমকালীন প্রকাশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ আলোর পথে যাত্রা

সরল পথের খোঁজে	১৩
টাইট্রেশন	২০
এবং, ফিরেছি আমিও	৩০
নীড়ে ফেরার গল্প	৩৩
পথিকের পথচলা	৪১
আলোয় ভুবন ভরা	৪৯
সেই সব দিনরাত্রি	৫৩
অন্ধের যাত্রা সমীকরণ	৬১
আপনারে খুঁজিয়া বেড়াই	৬৭
পথ ও পথিক	৭৭
সেই সময়ের উপাখ্যান	৮৬
সংশয় থেকে বিশ্বাস: এক পথিকের গল্প	৯২
আমি এবং আমাদের গল্প	১০৪
গল্পটা হাসি-কান্নার	১০৮
ফিরে পাওয়া গুপ্তধন	১১৩
চলতে ফিরতে যেমন দেখেছি	১২৪
দ্য আগলি ডাকলিং	১২৭
প্রত্যাবর্তন!	১৩২
ফিরে আসার গল্প	১৩৭
আমার মায়ের বিয়ের প্রস্তাব!	১৫৭
চলতে চলতে আলোর দেখা	১৬১

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ স্রষ্টার সন্ধানে

সেই মিছিলের দেখা ১৭৩

শুদ্ধ আলোর প্রথম প্রহর ১৮২

যেমন ছিলাম, যেমন আছি ১৮৯

ফেরার কথাই ছিলো ২০১

সরল পথের খোঁজে

মোহাম্মদ রুহুল আমিন, এমবিবিএস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

দীনের বাইরে বড় হওয়া একজন কিশোর যেভাবে, যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, আমার বেড়ে ওঠার গল্পগুলোও ঠিক সেরকম। খুব ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, পশুপাখিকে কষ্ট দেওয়া, বন্ধুদের সাথে মিলে অন্যের বাগানের আম চুরি করে খাওয়া, আব্বুর পকেটের টাকা চুরি করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ আচরণ করা, স্কুল পালানো, সিনেমা হলে যাওয়া, পূজা-মণ্ডপে যাওয়া—ইত্যাদি ছিল আমার জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

বাড়িতে নামাজ পড়েতেন শুধু আমার মা। বাবা নামাজ পড়তেন না, শুধু পড়াশোনার জন্যে বকাঝকা করতেন।

মা যদিও নামাজের জন্যে হালকা বকাবকি করতেন; কিন্তু দেখা যেত, জুমার দিন জুমার নামাজেও আমি যেতে চাইতাম না। নামাজে যাওয়ার কথা বলে অন্যদিকে চলে যেতাম। আমি ছিলাম প্রচণ্ড রকম সিনেমার পোঁকা। তখন আমাদের বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না। পাশের বাড়িতে সিনেমা দেখতে দেখতেই আমার বেশিরভাগ সময় কাটত।

আমার এমন ডানপিটে স্বভাবে মা আমার উপর চরম বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অবশ্য বিরক্ত হবারই কথা। বাবা আমাকে কথা শুনাতেন কম, আমার কৃতকর্মের সমস্ত ঝাল তিনি মায়ের উপরেই ঝাড়তেন। মায়ের আস্কারাতেই আমি মাথায় চড়েছি, নষ্ট হয়ে গেছি, কু-পথে চলে গেছি—ইত্যাদি নানান কথার বাণে জর্জরিত হতেন আমার মা। মা একদিন করলেন কী, আমাকে পাশের বাড়ি থেকে ধরে বাসায় নিয়ে

এলেন। বাসায় ঢুকিয়ে মা নিজের গলায় দড়ি পেঁছিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমি মরে গেলে শান্তি পাবি, তাই না? এই দ্যাখ, আমি মরে যাচ্ছি...'

আমি ছিলাম আমার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। মা বলেছিলেন, পর পর ছয়টা মেয়ে সন্তানের পর আমি নাকি তাদের কাছে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত হিসেবে জন্মেছি। রক্ষণশীল সমাজের চোখে তখন ছেলে সন্তান মানেই সবকিছু। আর মেয়ে সন্তান মানেই বোঝা। আমার বাবা-মায়েরও এরকম ধারণা। তারা ভাবতেন, আমিই তো তাদের অন্ধকারে আলোস্বরূপ। বৃদ্ধ বয়সের লাঠি। এজন্য আমি তাদের কাছে ছিলাম আদরের দুলালের মতো। সেই আমিই যখন এরকম বেঁকে বসলাম, তখন তারা দুজন আমাকে নিয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়লেন।

এরপর, হঠাৎ একদিন বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবার চিকিৎসা চলাকালীন আমার পড়াশোনায় যাতে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য আমাকে আমার বড় আপুর বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আপুর শ্বশুরবাড়ির পরিবেশটা ছিলো আমাদের পরিবেশের চেয়ে পুরোপুরিই ভিন্ন। পড়াশোনার জন্য চমৎকার একটা পরিবেশ বলা যায়। আশপাশের লোকগুলোও যথেষ্ট ধার্মিক। সবাই নিয়মিত নামাজ পড়ে, পর্দা-হিজাব করে চলে।

এরকম ভালো একটা পরিবেশে এসে আমি যে একেবারেই বদলে গেলাম—তাও না। আমার দুরন্তপনা, ডানপিটে স্বভাবগুলো তখনও বলবৎ ছিল আগের মতোই। আমি খুঁজে খুঁজে আশপাশ থেকে আমার স্বভাবের ছেলেগুলোকে বের করলাম। তাদের সাথে আড্ডা দিতাম। সময় কাটাতাম। আপুর শ্বশুরবাড়ির সবাই যেহেতু ধার্মিক শ্রেণির ছিলেন, আমি নামাজ না পড়লে কেমন যেন একটু বেমানান দেখায়। সমালোচনার ভয়ে মসজিদে যেতে হতো। কিন্তু মন থেকে নামাজ পড়তাম না কখনোই। বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা,আমোদ-ফূর্তি করতাম, সিনেমা দেখতাম, নাচতাম, গান গাইতাম—কিন্তু মানসিক তৃপ্তিটা আর পেতাম না।

একদিন সিনেমা দেখার জন্য টিভি অন করলাম। চ্যানেল পাল্টাতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, কোট-টাই পরা একজন লোক খুব স্মার্টলি কুরআন হাদিসের কথা বলছেন। তার লেকচার শোনার জন্যে নয়, বরং তার কোট আর টাই-ই যেন তার প্রতি আমার কৌতূহলের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিল। ইতোপূর্বে কোট-টাই পরা

কোনো লোককে তো কখনো হাদিস বলতে দেখিনি। চ্যানেল পাল্টালাম না। শুনতে লাগলাম। একটু পরে বুঝতে পারলাম, উনি একজন ডাক্তার। কিন্তু একজন ডাক্তার ডাক্তারি না করে ধর্ম প্রচারে নামল কেন, সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। লেকচারের একপর্যায়ে শুনি, লোকটি নিজেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র বলে ঘোষণা দিচ্ছেন।

আমি অবাক হলাম। একজন ডাক্তারের তো ডাক্তারি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার কথা। মেডিকেল সায়েন্সের কঠিন কঠিন টার্ম উনি মুখস্ত করবেন, হাত উঁচিয়ে উঁচিয়ে সেসব মানুষকে বোঝাবেন—এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এ আবার কেমন ডাক্তার, যিনি কঠিন মেডিকেলীয় টার্মের বদলে স্টেজে দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত নম্বর, হাদিস নম্বর, ফতোয়া নম্বর , বেদ, গীতা, রামায়ণ, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে এক নিঃশ্বাসে বলে যান। একটু থামাথামি নেই। স্টেজের সামনে রথী-মহারথী, সেলেব্রেটি, ধর্মগুরুরা আসীন। সবাই এই লোকের উপস্থিত বক্তৃতা, মেধা আর তার প্রয়োগ দেখে অবাক। একটু পরপরই সবাই হাত তালি দিয়ে লোকটাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।[১] একটা লোক কীভাবে এতকিছু একসাথে মুখস্ত রাখে? তাও আবার বইয়ের নাম, পৃষ্ঠা নম্বর, লাইন নম্বরসহ! আমি অভিভূত হলাম। এটা কীভাবে সম্ভব!

ছোটবেলায় শুনেছিলাম, কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি নাকি যেকোনো বই একবার পড়েই বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলতেন। এর কারণ, একবার পড়লেই নাকি তার সব মুখস্ত হয়ে যেত। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। কিন্তু কোট-টাই পরা এই লোকটাকে দেখে আমার মনে হলো, আল্লাহ তাআলা মনে হয় কাউকে কাউকে অসীম অনুগ্রহ দান করে থাকেন। ইনিও তাদের মধ্যকার একজন।

যে চ্যানেলে এই লোকটিকে প্রথম দেখি, সেই চ্যানেলটার নাম 'পিস টিভি'। আস্তে আস্তে নিয়মিত এই চ্যানেল দেখা শুরু করলাম। টিভি অন করে 'পিস টিভি' খুলে বসে অপেক্ষা করতাম। কবে আসবে সেই কোট-টাই পরা লোকটি। কখন শুনবো তার মনোমুগ্ধকর কথামালা। লোকটির নাম জাকির নায়েক। ডাক্তার জাকির নায়েক। জন্মেছেন আমাদের পাশের দেশ ভারতে।

---

১ উল্লেখ্য, হাততালি দেওয়া একটি গর্হিত কাজ এবং তা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো ইসলামি সভা-সম্মেলনেও অত্যুৎসাহী দর্শক-শ্রোতাকে হাততালি দিয়ে আলোচককে অভিবাদন জানাতে দেখা যায়। অভিবাদন জানানোর জন্য আরও অসংখ্য পন্থা আছে। তাই হাততালির বিষয়টি অবশ্যই বর্জনীয়। প্রয়োজনে দেখুন— https://islamqa.info/ar/105450 । —শরয়ি সম্পাদক

নিয়মত পিস টিভি দেখার মধ্য দিয়ে আমি খেয়াল করলাম, আস্তে আস্তে আমার মাঝে কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। নামাজ পড়া শুরু করলাম নিয়মিত। একটা সময়ে লোক দেখানো কিংবা নেহাৎ সমালোচনার ভয়ে নামাজ পড়লেও, এরপর থেকে মন থেকেই নামাজ পড়তে শুরু করলাম। আখেরাতের ভয় মনের মধ্যে জেঁকে বসেছে তখন। ওয়াজ মাহফিলগুলোতে যাওয়া শুরু করলাম। জামআতবদ্ধভাবে নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে লাগলাম। বন্ধুদের নিয়ে আর সিনেমা দেখতে যাই না। আড্ডা দিই না। অহেতুক সময় নষ্ট করি না। দীনটা তখন আমার ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হতে শুরু করল। আমার জগত তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবমান। আমি আবিষ্কার করলাম, আমার অন্তরে শান্তির মোলায়েম বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। নিজের ইমানকে পাকাপোক্ত করা এবং আমলের পরিমাণ বাড়ানোতেই তখন আমার সবরকম মনোযোগ। দাঁড়ি-টুপিতে তখন আমি যেন এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা, যে জগতে মৃত আত্মারা প্রাণ ফিরে পায়, মৃত অন্তর ফিরে পায় তার চিরন্তন সজীবতা।

নিজের অ্যাকাডেমিক পড়াশোনাতেও আগের চেয়ে বেশি মনোযোগী হতে শুরু করেছি। স্টুডেন্ট হিসেবে কখনোই খারাপ ছিলাম না। প্রাইমারি, মাধ্যমিক সবগুলোতেই স্কলারশিপ পেয়েছি এবং জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম।

কেবল পড়াশোনায় ভালো হবার ফলে সকলের কাছে আমি প্রশংসার পাত্র ছিলাম। কিন্তু, যখনই আমি দীনে ফিরে আসি, দাঁড়ি রাখি এবং নামাজ-রোজার প্রতি ঝুঁকে পড়লাম, আমার চারপাশের চেনা পরিবেশটাই যেন হঠাৎ করে আমার কাছে অচেনা হয়ে গেল। আমার কাছের মানুষগুলোই যেন দূরে সরে যেতে লাগল। দাঁড়ি রাখার ফলে কত লোকের কত কটু কথা যে শুনতে হয়েছে আমাকে—তার ইয়ত্তা নেই। আমার দাড়ি নিয়ে স্যারেরা বিদ্রুপ করত। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলত,-"ছেলেটা আবার জঙ্গির সাথে যোগ দিল নাকি?"

কিছু কিছু আত্মীয়দের কাছে শুনেছি, আমাকে নিজেদের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেও নাকি তারা সংকোচ বোধ করে। কেন? কারণ, আমার দীন। আমার লেবাস। মাধ্যমিকের পরে ইচ্ছে ছিল নটরডেমে ভর্তি হবো। পরে শুনলাম, সেটা নাকি খ্রিস্টানদের কলেজ। সেখানে ভর্তির জন্যে ক্লিন সেভড হতে হয়। ভয়ে নটরডেমে পড়ার ইচ্চাকে মাটিচাপা দিয়ে দিলাম।

সবচেয়ে ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়, যখন এইচএসসিতে রাজশাহীতে পড়তে যাই, তখন। বাংলাদেশে তখন অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল। সবদিকে দাড়ি-টুপিওয়ালা লোকদের ধরপাকড়, মারমার অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ, ক্যাম্পাসে এক কঠিন অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও আমি সুন্নাহর উপর অটল, দৃঢ় ছিলাম।

এরকম কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। একদিকে কাছের মানুষদের বিমুখতা, একদিকে দাঁড়ি-টুপির উপর খড়গহস্ত পরিবেশ, অন্যদিকে মেডিকেলে পড়ার সুতীব্র ইচ্ছা। আলহামদুলিল্লাহ, মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে নিরাশ করেননি। আমি মেডিকেলে চান্স পেলাম। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ করে দিলেন রাব্বে কারিম।

মেডিকেলে আসার পরে মনে হলো—নতুন আরেকটা জগতে চলে এসেছি। এখানকার স্যার আর ম্যাডামদের অবস্থা আরও খারাপ। সার্জারির ক্লাসে সেদিন প্রথম। আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন জনৈক প্রফেসর। ভদ্রলোক তার নামের আগে মুহম্মাদ লেখেন। পড়াচ্ছিলেন সার্জিকেল ইন্সট্রুমেন্টস। আমার দিকে কোণা চোখে তাকিয়ে বলছিলেন—"এটার নাম অ্যালিস টিস্যু ফরসেপ। এটা কিন্তু মুসলমানদের আলি-(রা:) এর ফরসেপ না, মুসলমানদের মাথায় মারামারির চিন্তা ছাড়া ভালো কোনো চিন্তা নাই"।

আরেকদিন, কমিউনিটি মেডিসিনের জনৈক ম্যাডাম আমাকে বললেন—"এই, তোমরা যে মাটিতে ঢিপ দাও, কী লাভ হয় এতে?"

আফসোস! অথচ, উনি মুসলিম পরিবারের মেয়ে।

ওই একই ডিপার্টমেন্টের অন্য একজন শ্রদ্ধেয়া ম্যাম তার লেকচার ক্লাসে বলছিলেন—"আমি শুনলাম, তোমাদের হোস্টেলে নাকি নামাজের জন্যে চাপ দেওয়া হয়? আমি যেহেতু একাডমিক কাউন্সিলের একজন সদস্য, এ ব্যাপারে অবশ্যই দাবি উত্থাপন করব, যেন নামাজের জন্যে আর ডাকাডাকি না করা হয়।"

মেডিকেলে একটা ব্যাপার আছে। চাইলেই কেউ স্যার বা ম্যাডামদের বিপক্ষে কথা বলতে পারে না। কেননা, আমাদের পাশের বেশিরভাগ নম্বর আসে ভাইভা থেকে। সুতরাং কোনো ভাই যদি এসবের বিপক্ষে মাথা তুলে জবাব দেন, আর দুর্ভাগ্যবশত,

টাইট্রেশন

ডা. শামসুল আরেফীন, এমবিবিএস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, লেখক—ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

- 'আচ্ছা তোরা রাজনীতি করতে চাস কেন? একজন একজন করে বল'।
- 'ভাই, আমি ইঁদুরের মতো বাঁচতে চাই না'।

হিদায়াত, পথের খোঁজ। কোন পথ? কেমন সে পথ? পিচঢালা, না মেঠো, না ডিজিটাল? সে পথ বড় সহজ, বড় আরাম। ছোটবেলা থেকে আমাদের মাথায় পুঁজিবাদী, 'স্বল্পমূল্যে শ্রমসন্ধানী' সিস্টেম একটা কথা শিখিয়ে দিয়েছে—লাইফ ইজ নট অ্যা বেড অব রোজেজ। জীবনটা ফুলের বিছানা নয়। জীবন খুব কঠিন, টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। বস্তুবাদী সমাজে বস্তু কেনার যোগ্যতা চাই, নাহলে কমফোর্ট জোনে থাকতে পারবা না । লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে সে। গাড়ি-বাড়ি-নারী-কাঁড়িকাঁড়ি কড়ি-ছড়ি এগুলোর জন্য দৌড়াও, ভাগো।

আরেকটা পথ আছে, কমফোর্ট জোনে ঢোকার পথ, আরাম-শান্তি-সুখের পথ। কমফোর্টের জন্য যে পথে উন্নত বস্তু লাগে না, কুঁড়েঘরেই-অর্ধাহারেই-হাঁটাপায়েই সেখানে কমফোর্ট মেলে। অর্জনের প্রতিযোগিতা নেই সেপথে। শুধু আছে বিসর্জনের প্রতিযোগিতা। 'বস্তু ভোগের মাঝে তৃপ্তি' আগের ওই পথে। আর এই পথে —'ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ', আসল সুখ।

এই পথের সন্ধান পাওয়াকেই বলছি হিদায়াত, যে পথের দুধারে ফুলের মতো ফুটে থাকে সুখেরা। আমি কোন কিতাবী নীতিবাক্য বা কম্যুনিজমীয় ইউটোপিয়া বা ঠাকুরমার ঝুলির কথা বলছি না। রেগুলার শেভের আড়ালে পাকা দাড়ির গোড়ার মতো বাস্তব, কড়া মেকআপের আড়ালে প্রৌঢ়ার ভাঁজ পড়া চামড়ার মতো বাস্তব

এক পথের অস্তিত্ব জানাচ্ছি আপনাদের, যেখানে সুখের অভিনয় করে প্রতি মুহূর্তে মরতে হয় না। সে রাস্তায় 'দম নিলেও' ঘ্রাণ পাওয়া যায় সুখের, এতটাই সস্তা সেখানে সুখ। একটা ছেলের গল্প শোনাবো আজ।

'ছেলেটি'র জগতটাও টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত-সন্তানের জীবন-দর্শনে ঠাসা। পুঁজিবাদের সেবা করে নিজের কমফোর্ট জোন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য 'পুঁজিবাদের ঠিক করে দেওয়া শিক্ষাটা' ভালোমতো আয়ত্ত্ব করাটা জরুরি। যেখানে ভালো বাবা, ভালো স্বামী, ভালো সন্তান কীভাবে হতে হয়—তা নেই। ভালো চাকর হয়ে কীভাবে ভালো চাকরি করা যায়, শুধু সেটা শিখলেই যথেষ্ট। এরপর বস্তু আহরণের জন্য এমনভাবে চাকরগিরি করবে, যাতে সন্তান বাপ-মাকে কাছে না পায়। বস্তুর জন্য যৌতুক চেয়ে বউ পেটাতেও না বাধে। আর, বুড়ো বাপের সম্পত্তি লিখে নিয়ে আশ্রমে পাঠিয়ে নিজের কমফোর্ট জোন নিশ্চিত করা যায়। ভালো বাবা, ভালো স্বামী, ভালো সন্তান হওয়া শেখেনি যে, শিখেছে শুধু বস্তু লাগবে নিজের কমফোর্টের জন্য—গাড়ি-বাড়ি-আইফোন-বাইক। সে জগতে বস্তুই সব, বাকি সব মিথ্যে।

তো, দক্ষ চাকর হবার জন্য ছেলেটা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হলো। সেখানে নাকি চাকর হবার সব গুণগুলো বিকশিত হয়—মনিবের ভাষায় পটাপট কথা বলা, কো-কারিকুলার্স, সুস্থ-সবল-বেশি কর্মক্ষম চাকর তৈরি। ভালো অর্থেই বললাম। ডানপিটে ছেলেটা কঠোর নিয়মের মাঝে আবিষ্কার করে বসল এক মহাসত্য—নিয়ম ভাঙার মজা। জামাআতের সাথে মাগরিবের নামাজ পড়াটাও একটা নিয়ম ছিল সেখানে। আল্লাহ ছেলেটাকে মাফ করুন।

আবারও ওই নিয়মের ভয়েই আইএসএসবি-তে গ্রিনকার্ড পেয়েও গেল না ছেলেটা। ভার্সিটি লাইফ এনজয় করতে হবে তো। ফ্রেন্ডস-আড্ডা-ঘোরাঘুরি-বিপরীত-লিঙ্গের সান্নিধ্য—এসব ছেড়ে আর্মিতে গিয়ে যৌবন বরবাদ করার কোনো মানে হয়? শেষমেশ স্বপ্নের ঢাবি ক্যাম্পাসে কাঙ্ক্ষিত সাবজেক্ট (জেনেটিক্স) না পেয়ে একপ্রকার হতাশ হয়েই ভর্তি হলো ঢাকার এক সরকারি কসাইখানায়। কাহিনি শুরু হচ্ছে এখন...

প্রথম ফোঁটা :

- 'বাবা, এদিকে আয়, দেখে যা'
- 'জি আব্বু, আসছি...'

- 'এই দ্যাখ, এই লোকটা ডাক্তার। দ্যাখ কীভাবে অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেয়। একদম মুখস্থ। শোন একটু'

- 'তাই নাকি? আচ্ছা লোক তো!'

টিভিতে দাড়িওয়ালা, কোট-টাই পরা হালকা-পাতলা গড়নের এক লোক। 'স' উচ্চারণে একটু সমস্যা, 'নাম্বার ওয়ান' বলার সময় বুড়ো আঙুল আগে তোলে। খ্রিস্টান পাদরি যেন আজন্ম-বোবা, হিন্দু পন্ডিত যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ছেলেটা মুগ্ধ হয়ে দেখে আর ভাবে—আমিও তো ডাক্তারি পড়ি, আমিও তো পারি এমন করে মানুষের হিদায়াতের উসিলা হতে।

ছেলেটা কল্পনায় স্টেজে লোকটার জায়গায় নিজেকে ভাবে। 'নাম্বার ওয়ান' বলার সময় বুড়ো আঙুল আগে দিয়ে। পটাপট বলে চলে বাইবেল-গীতা-ঋগবেদ-কুরআনের চ্যাপ্টার-ভার্স নাম্বার। আমাদের ছেলেটার কুরআনের অনুবাদ পড়ার আগেই 'ইংরেজি একটা বাইবেল' আর 'গসপেল অব বার্নাবাস' শেষ হয়ে গেল। ডাউনলোড হয়ে গেল বেদের সব খণ্ডই, 'আফ্রিকান ধর্মগুলোর পবিত্র শ্লোক' আর 'প্রাচীন চৈনিক ধর্মপুস্তক'। 'ডেড সি স্ক্রল' নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখত, আর সুরিয়ানি ভাষায় (আরামায়িক, ইসা আলাইহিস সালাম-এর নিজের ভাষা) লিখত খাতার মলাটে নিজের নাম। এভাবেই চলছিল ফার্স্ট ইয়ারের সোনালি দিনগুলো।

ভালো চাকর হবার প্রতিযোগিতা কেড়ে নিল সব। সঅঅঅব। ভয়ংকর সব বই, হোস্টেল লাইফ আর কিন্নরী হাসিগুলো 'আসল' রাস্তায় ফিরিয়ে নিল ছেলেটাকে। হঠাৎ একদিন দেখল, ভার্সিটি লাইফ যতটা হৈ-হুল্লোড় হবার কথা ছিল, অতটা আর হচ্ছে না। মেডিকেল কলেজের টিচারদের কড়া শাসন আর প্রথম ব্যাচের হম্বিতম্বিতে সব বরবাদ হচ্ছে, কিন্ডারগার্টেন বানিয়ে ফেলেছে একদম। এভাবে তো আর চলে না। এই প্রেসার থেকে উত্তোরণের পথও পাওয়া গেল—ছাত্ররাজনীতি। সীনা টান টান করে হাঁটা। টিচার-সিনিয়র-জুনিয়রদের সমীহের দৃষ্টি, দাবি-আন্দোলনের অ্যাডভেঞ্চার। হুমমম, চেতনার ডিলারশিপ নিয়ে নিল ছেলেটা। কেন রাজনীতিতে আসতে চাচ্ছে, বড়ভাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি জবাব দিয়েছিল—'ভাই, আমি ইঁদুরের মতো বাঁচতে চাই না'।

আর চেতনার সাথে একটু এসব না হলে চলে? এসবের সাথে একটু 'ওসব' না হলেও 'সেসব' তো লাগেই। না হলে রাজনীতি জমেই না মোটে।

মোহ আর মিথ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে একটা সময় আত্মাগুলো নিমজ্জিত হয় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। সেই ভয়ার্ত অন্ধকার কূপ থেকে কেউ আলোর দেখা পায়, কেউ পায় না। কেউ নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার সুযোগ লুফে নেয়, কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলে অতল থেকে অতলে। যারা ফিরে আসে, কেমন হয় তাদের গল্পগুলো? সে রকম একঝাঁক পরিশুদ্ধ আত্মার গল্প নিয়েই 'প্রত্যাবর্তন'।

ISBN
9 789843 439574

সমকালীন প্রকাশন